গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৫ সংখ্যা-৪ জুলাই-আগস্ট ২০১৮ RNI No WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

❑ প্রচ্ছদ কথা ২ ❑ উদ্ভিজ্জ রঙের ইতিহাস ৪ ❑ নতুন গবেষণা ৫ ❑ নিপাহ ৬ ❑ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ৭ ❑ প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ৮ ❑ অঙ্ক : গোল্ডবাখ সংখ্যা ৯ ❑ কুসংস্কার ১০ ❑ বজ্রপাত ১১ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ১২ ❑ সংবাদ ১৪ ❑ মহাকাশ ১৫ ❑ জানো কি? / কবিতা / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা : দ্বন্দ্ব

নাম কালিদাসি মণ্ডল। স্থান হাসনাবাদ। ঘটনার উৎস অলৌকিকত্বের আকাঙ্ক্ষা। ঘটনাটি এই রকম—গ্রামের একটি আসরে সাপের দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে কালিদাসি মনসা সেজেছেন। হাতে জ্যান্ত সাপ। ঐরকম অবস্থায় দর্শকেরা যখন দেবীর 'অলৌকিক ক্ষমতা'য় মন্ত্রমুগ্ধ, তখনি ছন্দ পতন। সাপটি পীড়ন সহ্য করতে না পেরে কালিদাসিকে দংশন করে। স্বাভাবিকভাবেই কালিদাসি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। অলৌকিকত্বের এই ঘনঘোর পরিমণ্ডলে প্রশ্ন আসে—করণীয় কি? আরোগ্যের জন্য তাকে দ্রুত হাসপাতালে এনে অ্যান্টিভেনাম সিরাম (AVS) ইনজেকশন দেবেন নাকি দেবীই তাকে বাঁচিয়ে তুলবেন। তার জন্য দেবীর লৌকিক প্রতিনিধি ওঝার শরণাপন্ন হতে হবে। কয়েকজন যুবক তাকে হাসপাতালে নিতে চাইলেও তখনও ঘোরে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে তাকে ওঝার কাছেই নিয়ে গেলেন। দেখা গেল ২ ঘন্টা ব্যাপি ওঝার যাবতীয় মন্ত্রতন্ত্র ও অনেক কেরামতি সত্ত্বেও কালিদাসির মৃত্যু হল।

আসলে এইরকম 'অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা'র ঘটনা নানা রূপে পৃথিবীর যত্রতত্র ঘটে চলেছে। তারই সাথে জোড়ালো হচ্ছে একটি দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটি অলৌকিকত্ব বনাম লৌকিক বিজ্ঞান বাস্তবের। একদিকে আজন্ম লালিত অলৌকিকত্বে বিশ্বাস অন্যদিকে ছোট থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা। 'সত্যি। অলৌকিক ঘটনা ঘটে।'—মা বলেছেন। বাবাও বলেছেন। প্রতিবেশীও বলছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও তার ব্যবহার বলছে---কোন কিছুই অলৌকিক নয়। সব ঘটনাতেই কোন না কোন যুক্তি আছে। আমি বিজ্ঞানের দান বর্তমান সভ্যতায় ডুবে থাকবো। তাকে আমার সকল স্বার্থে ব্যবহার করবো। কিন্তু বিশ্বাস করবো না। কারণ তাকে মানলে অলৌকিকত্বের কি হবে? অলৌকিক ভাবনা ছাড়তে হবে? মা বাবা অভিভাবকেরা হেরে যাবেন? আজন্মলালিত অলৌকিকত্বের কল্পনা যে ভরসা দিয়ে আসছে তার কি হবে? কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে অনেক অনেক প্রশ্নের সামনেও দাঁড় করাচ্ছে। যুক্তি দিয়ে অলৌকিক কল্পনার জাল ছিড়ে ফেলছে।

যাই হোক চাকা বোধহয় ঘুরছে। এখন অনেক মানুষই বিজ্ঞানের যুক্তির দিকে আসছেন। তার প্রমাণ—ঐ আসরে উপস্থিত কয়েকজন যুবক যারা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কালিদাসিকে বাঁচাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

অন্ধকার কেটে আলোর প্রবেশ হচ্ছে। রুখবে কে?

স ম্রা ট স র কা র

প্রচ্ছদ কথা : পাখি কেন পাথর খায়?

বেশ কিছু প্রাণী আছে যারা খাবার সঙ্গে কাঁকর খেতে পছন্দ করে। কাঁকরকে তারা খাবার হিসেবে না খেলেও কাঁকর তারা নিয়মিত গলাধঃকরণ করে। কিন্তু কেন করে? কারা করে? কখন করে? সম্ভাব্য উত্তরগুলো কিন্তু বেশ চমৎকার।

লাল-মাথা বাঁশপাতি বা ইংরেজিতে Chestnut-headed Bee-eater। পাখিটা সমস্ত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে পাওয়া যায়। মানস জাতীয় উদ্যানে একটি শুকিয়ে যাওয়া নদীতে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলাম গত এপ্রিল মাসে।

নদীতে জল না থাকায় গাড়ি নদীবক্ষে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। দুপাশে উঁচু পাড়ে পাখিগুলোর অসংখ্য বাসা। পাড়ের মাটির গায়ে গর্ত করে সুড়ঙ্গ বানিয়ে ওরা বাসা বাঁধে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় হঠাৎ দেখলাম একটি পাখি পাথরের খাঁজে মন দিয়ে কি খুঁজছে।

বাঁশপাতি সাধারণত উড়ন্ত অবস্থায় পতঙ্গ শিকার করে। কিন্তু এই পাখিটা পাথরের খাঁজে কি খুজছে? ভালো করে খেয়াল করতেই দেখা গেল পাখিটা ঠোঁটের ফাঁকে তুলে নিয়েছে ছোটো পাথরের টুকরো। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল। এবং অবলীলায় গিলে ফেলল। কম-বেশি সমস্ত পাখি যারা ফলমূল, শস্যদানা, ঘাসপাতা অথবা পোকামাকড় খায় তারাই পাথর গলাধঃকরণ করে। এখন প্রশ্ন কেন করে? তার উত্তর পেতে গেলে সহজ করে পাখির পাচনতন্ত্র বুঝতে হবে যা মানুষের থেকে অনেকটাই আলাদা।

পাখিদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের খাবার চিবানোর জন্য দাঁত নেই। যেসব পাখিদের সামান্য দাঁত আছে তারা তা দিয়ে বড়জোর খাবার গেঁথে ফেলতে পারে কিন্তু খাবার চিবিয়ে মন্ড পাকাতে পারে না। প্রাথমিক ভাবে খাবার মুখগহ্বরে প্রবেশের পর গ্রাসনালী, ক্রপ ও তারপর প্রভেন্টিকিউলাস হয়ে গিজার্ড-এ যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ক্ষেত্রে মূলত এই একই পথে খাবার পাচিত হয়। তবে

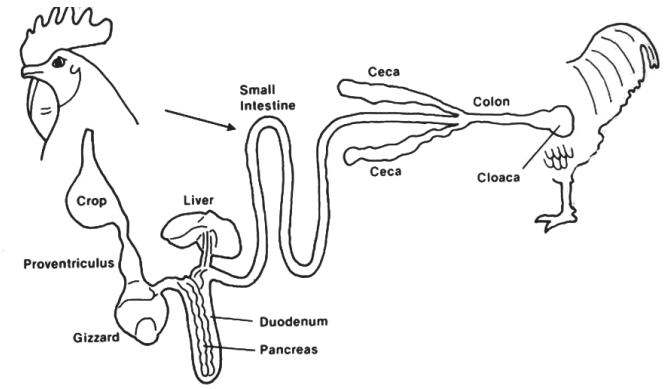

খাদ্যাভ্যাস ভেদে এই প্রণালীর কিছু হেরফের হতে পারে। বিশেষ করে শস্যভূক (seed-eating) বা বাঁশপাতির মত পতঙ্গভূক পাখি তাদের গিলে ফেলা আস্ত খাবার এই গিজার্ডেই ভেঙেচুরে মন্ড পাকায়।

গিজার্ড হল পাখির পাকস্থলীর দ্বিতীয় অংশ এবং মজা করে বলা যেতে পারে পাখির দাঁত ও মুখগহ্বর। গিজার্ড আসলে মোটা, শক্ত পেশীবহুল দেওয়ালযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠ যেখানে খাবার পেষাই (grinding) হয়। এখানেই প্রয়োজন পরে পাথরের টুকরোর। গোটা একটা পতঙ্গের শক্ত অংশগুলো (যেমন—পা, মাথা, ডানা) ছোটো ছোটো পাথরের মাঝে পড়ে টুকরো টুকরো হয় ও মন্ডে পরিণত হয়। গিজার্ডের শক্তপোক্ত পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এই পেষাই চলে।

পাখি তাদের খাদ্য পরিপাকের এই অসামান্য কার্যকরী পদ্ধতি একদিনে আবিষ্কার করেনি। প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করা Palaeortyx গণের (genus) পাখিদের ফসিলে এই 'পাকস্থলীর পাথর' পাওয়া গেছে। Palaeortyx গণের পাখিরা ছিল মূলতঃ তিতির, বটের বা মোরগ জাতীয় পাখি (galliform)। যে গণের কোন পাখিই আজকের পৃথিবীতে নেই। প্রায় এক কোটি বছর আগেকার psittacosaurus গণের ডাইনোসরদের ফসিলেও এর প্রমাণ মেলে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো আস্ত খাবার পাকস্থলীতে গুঁড়ো করার জন্য যে শুধু পাথরের টুকরো পাখি খায় তা নয়। গবেষক Verbeek ১৯৬৯ সালে মন্টেরে, ক্যালিফোর্নিয়াতে পর্যবেক্ষণ করেছেন একটি স্ত্রী Anna's Hummingbird নিয়মিত বালি খেতে আসছে একটি নির্দিষ্ট বড় পাথরের কাছে। আমি এই মানস জাতীয় উদ্যানেই পর্যবেক্ষণ করেছি বিভিন্ন রকমের হরিয়াল সকালে এবং সন্ধ্যায় শুকনো ও পোড়া কাঠের গুঁড়ি থেকে ছোট ছোট টুকরো খেয়ে চলেছে। আবার এই বাঁশপাতিই কখনো মৃত শামুকের খোল খায়।

সবই যে তাদের পাকস্থলীর খাবার পেষাই-এর জন্য এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ পাথরের টুকরো তাদের আসন্ন প্রজনন মরসুমে ডিমের খোলের পুরুত্ব বৃদ্ধি করে। বহু পাখি তাদের প্রজননের সময়, বিশেষ করে তাদের ডিম্বাশয়ে ডিমের খোল তৈরি হওয়ার সময় ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ পাথর খাওয়া বাড়িয়ে দেয়। বাঁশপাতির কয়েকশো বাসা আমার পর্যবেক্ষণস্থলের আশেপাশে ছিল। নদীবক্ষের পাথরে ক্যালসিয়াম থাকা একটুও আশ্চর্যের নয়। যদিও এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় কারণ পাথরগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমি করিনি এবং পাখিটি স্ত্রী কিনা তা বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যেতেই পারে পাখিটা বেশ বাছাই করে পাথর তুলে নিচ্ছিল।

এখন প্রশ্ন আসতেই পারে কোন ধরনের পাথর সে বেছে নেবে। আকৃতি এবং রং, দুটোই এখানে আলোচনার বিষয়। পাখিটা তিন থেকে চারটি পাথর খেয়েছিল। সবই একটু লম্বাটে, একেবারে গোলাকার নয়। এবং এটাও লক্ষ করার বিষয় যে পাথরগুলোর গড় আয়তন প্রায় সমান। এই পরিসরে একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে পাকস্থলীর খাদ্যের (পোকা, ভ্রমর, ফড়িং ইত্যাদি) আয়তন ও কাঠিন্যের ওপর নির্ভর করবে কত বড় ও কি আকারের পাথর খেতে হবে। সেইসাথে এটাও পাখি বিবেচনা করে যে গিলে ফেলা পাথর তার গ্রাসনালী দিয়ে নিশ্চিন্তে পার হবে কিনা। আরেকটি বিষয় মাননীয় পাঠককে উল্লেখ করতে চাই। খাবার জন্য নেওয়া পাথরগুলো রং ছিল ধূসর। যদিও নদীবক্ষে একই আয়তনের আরো অনেক রং-এর পাথর ছিলো। গবেষক A.P. Moller এবং J. Erritzoe ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ডেনমার্ক-এ ৩০৯টি পাখির গিজার্ড ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন একই প্রজাতির বা ভিন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে আলাদা আলাদা রং-এর পাথর খাওয়ার প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে। তাঁরা দেখিয়েছেন যেসব পাখির পুরুষ ও স্ত্রী আলাদা রঙের হয় সেইসব পাখিরা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকারের ও কয়েকটি নির্দিষ্ট রং-এর পাথর খাওয়া পছন্দ করে। বেশি রঙিন (multicolour) পাখির হরেক রকম রঙিন পাথর খাওয়ার প্রবণতা। আবার স্ত্রী-পুরুষ হিসেবে বিচার করলে রঙিন পুরুষের পছন্দ রঙিন পাথর। তুলনায় বিবর্ণ স্ত্রী-পাখির পছন্দ অনেকটাই ম্যাড়মেড়ে। গবেষকেরা মনে করেন পাখিদের এই পাথর খাওয়ার সাথে তাদের পালকের রঙের ঔজ্জ্বল্যের সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ পাথরের ভেতরে এমন কিছু রাসায়নিক বস্তু থাকতে পারে যা থেকে তাদের পালকে নির্দিষ্ট রঙের রঞ্জক তৈরি হয়। আর কে না জানে দেহের পালকে যত উজ্জ্বল রঙ ধরবে তত তাড়াতাড়ি যুতসই সঙ্গিনী মিলবে!

আবার ফিরে আসি ছবির পাখিটার কথায়। তার পছন্দের পাথরের রঙ ছিল গড়পড়তা ধূসর। তবে কি পাখিটা স্ত্রী (যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষ বাঁশপাতি পাখি একই রকম দেখতে)? সে কি সারাদিনের খাবার ভালো করে হজম করার জন্য পাথর খাচ্ছিল? নাকি তার শরীরের ভেতরে তৈরি হতে থাকা ডিমে খোলের পুরুত্ব বাড়ানোর জন্য! নিশ্চিত উত্তর নেই। আর এখানেই পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চার মজা। যা একটি পর্যবেক্ষণ থেকে নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি করে। নতুন নতুন চিন্তার, গবেষণার দিক উন্মোচন করে।

M : 9433962227 ● e-mail : samratswagata11@gmail.com

জয়শ্রী দত্ত

উদ্ভিজ্জ রঙের ইতিহাস ও ব্যবহার

প্রাকৃতিক রঙের উপাদান হিসাবে গাছপালার ব্যবহার প্রাণীজ উপাদান ব্যবহারের থেকেও প্রাচীন। ২৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দেই কমলা হলুদ রঙের জন্য হেনার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলে কেশরের উল্লেখ আছে। কেশর থেকে পাওয়া যায় উজ্জ্বল হলুদ রঙ। অথর্ব বেদেও প্রাকৃতিক রঙ হিসাবে হলুদ, মঞ্জিষ্ঠা, পলাশ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চতুর্থ শতকে প্রাকৃতিক রঙের উপাদান হিসাবে মঞ্জিষ্ঠা, ব্রাজিল উড ইত্যাদি গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মঞ্জিষ্ঠা

মঞ্জিষ্ঠার বিজ্ঞান সম্মত নাম—রুবিয়া কার্ডিফোলিয়া (*Rubia cordifolia* L), এর শেকড়ে অ্যালিজারিন (Alizarin) নামে এক জৈব যৌগ পাওয়া যায়। এই যৌগ দিয়েই তৈরি হত কাপড় রং করার লাল রং। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অ্যালিজারিনের জন্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক ফসল হিসাবে মঞ্জিষ্ঠার চাষ করা হত। কাপড় রং করার জন্য যে লাল রং তৈরি করা হত তা রোজ ম্যাডার (Rose maddar) নামে বিখ্যাত ছিল। শুধু কাপড় রং করার জন্য নয়, ছবি আঁকার রং বা পেইন্ট হিসাবেও বিখ্যাত ছিল।

পরবর্তীকালে অ্যালিজারিন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হওয়ার ফলে রং তৈরির জন্য মঞ্জিষ্ঠার গুরুত্ব কমে যায়। মঞ্জিষ্ঠার শিকড় অবশ্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির জন্য আজও ব্যবহার করা হয়।

লটকন

উদ্ভিজ্জ রঙের জন্য বিখ্যাত আর একটা গাছ হল লটকন। লটকন লিপস্টিক ট্রি নামে বিখ্যাত। প্রাচীনকালে আজটেক সভ্যতার মানুষরা শরীর ও ঠোঁট রাঙানোর কাজে এই গাছের বীজ ব্যবহার করতো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয় অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো-ডি-ওরেলানা (Fransisco-de-Orellana) আমাজন নদী অভিযানের সময় খুঁজে পেয়েছিলেন এই গাছ। পরে লিনিয়াস, ওরেলানার নাম অনুসারে গাছটার নাম দেন বিক্সা ওরেলানা (*Bixa orellana* L.), গোত্র—বিক্সাসি (Family–Bixaceae)। সপ্তদশ শতকে স্পেনীয় অভিযাত্রীদের মাধ্যমে এটা ভারতবর্ষে আসে। রাসায়নিক রং আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এর বীজ থেকে পাওয়া লাল রঙের জন্য, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ করা হত। বীজের খোসায় থাকা ক্যারোটিন জাতীয় রঞ্জক কণা নরবিক্সিন থেকেই মূল্যবান হলুদ ও লালচে কমলা রঙটা পাওয়া যেত। শুধু কাপড় রং করা বা ছবি ও দেয়াল রং করার জন্য নয়; খাবার জিনিস যেমন চীজ, চকোলেট ইত্যাদি রঙের জন্য লটকনের বীজ আজও ব্যবহার করা হয়।

গাছপালা থেকে পাওয়া রঙের আলোচনার সময় লাইকেন থেকে পাওয়া রঙেরও উল্লেখ করতে হয়। লাইকেন আসলে ছত্রাক ও নীলচে সবুজ বা সবুজ শ্যাওলার পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কে (symbiotic relationship) গড়ে ওঠা সহাবস্থান। এখানে ছত্রাক সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় খাদ্যরস আর শ্যাওলা করে সালোকসংশ্লেষ।

রসেল্লা টিঙ্কটোরিয়া (*Rocella tinctoria*) নামে এক ধরনের লাইকেন থেকে পাওয়া পার্পল বা লালচে বেগুনী রঙের উল্লেখ পাওয়া যায় বাইবেলেও। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক ও রোমান যুগেও প্রাকৃতিক রং হিসাবে লাইকেনের ব্যবহার দেখা যায়। ১৫৪০ সালে Venetian Giovani Ventura Rosetti নামে এক লেখক "Pichto dell'arte de tinctori" নামে একটি বই প্রকাশ করেন; তাতে লাইকেন থেকে কি ভাবে রং তৈরি করা যায় সেই বৃত্তান্ত লেখা ছিল। স্কটল্যান্ডে বহু প্রাচীন কাল থেকেই পারমেলিয়া গণের বিভিন্ন লাইকেন রং তৈরিতে ব্যবহার করা হত।

লাইকেন

ক্ষারীয় বা অম্লত্ব পরীক্ষা করতে যে লিটমাস কাগজ আজও আমরা পরীক্ষাগারে ব্যবহারে করি সেগুলো তৈরি হয় রসেল্লা গণের লাইকেনের রস থেকে। ক্ষারীয় দ্রবণে ঐ লিটমাসের রং হয় নীল আর আম্লিক দ্রবণে রং পাল্টে হয় বেগুনী থেকে লাল।

বর্তমানের পরিবেশ সচেতন যুগে গাছপালা থেকে পাওয়া রঙের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন শিল্প যেমন বস্ত্র, প্রসাধনী, চামড়া, খাদ্যসামগ্রী বা ওষুধ তৈরির বেলায় প্রাকৃতিক রঙের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই রং শুধু যে পরিবেশ সহায়ক তাই নয় এগুলো আমাদের ত্বকের পক্ষেও ভালো।

আমাদের প্রয়োজনীয় গাছপালার অভাব নেই তবে জঙ্গল থেকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ না করে উপযুক্ত চাষের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করতে হবে। "উদ্ভিদজাত রঙ ক্ষতিকর নয়" প্রচারটাও চালাতে হবে।

M : 9831060548, e-mail : jayashree.datta@yahoo.co.in

নতুন গবেষণার অলিন্দে

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্ত্তী

কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে জ্বালানী

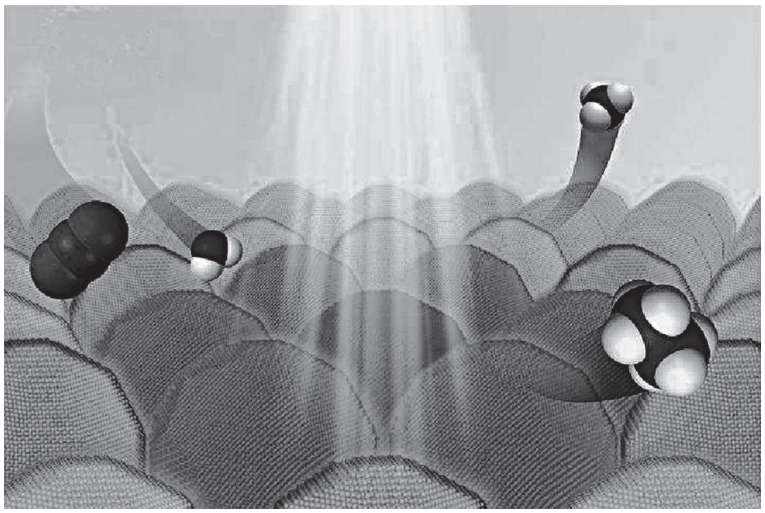

গ্রাফিকস : সানজু ইউ

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররা বুঝতে পারে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদের ভূমিকা। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে গাছেরা তাদের সবুজ পাতায় থাকা ক্লোরোফিলের সহায়তায় জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করে। বিজ্ঞান বইতে এই প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষ নামে পরিচিত। আরেকটু বড় হয়ে ওরা জানতে পারে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ; যেখানে ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে ছয় অনু জল রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হয়ে এক অনু গ্লুকোজ উৎপন্ন করে ও ছয় অনু অক্সিজেন মুক্ত হয়; জীবজগতের সাপেক্ষে বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের সবচেয়ে উপযুক্ত পরিণতি। আরেকটু গভীরভাবে জানতে চাইলে আমরা দেখবো যখন সূর্যালোক গাছের পাতায় এসে পড়ে তখন সবুজ-রঞ্জক ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয়ে ইলেকট্রন বর্জন করে। এই বর্জিত ইলেকট্রনগুলিই প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া এতদিন সম্ভব হয় নি। তবে ধৈর্য্য হারাননি বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি Nature Chemistry জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এক মূল্যবান গবেষণা প্রবন্ধ। গবেষকদলের প্রধান ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক প্রশান্ত জৈন। সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ওঁরা ব্যবহার করেছেন সোনা (gold)-র মতো ইলেকট্রন সমৃদ্ধ ধাতব অনুঘটক। ওঁদের ব্যবহৃত গোল্ড পার্টিক্যালগুলি আকারে ১৩ থেকে ১৪ ন্যানোমিটার পর্যন্ত। আসলে আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন কণা নির্দিষ্ট আলোকীয় ধর্ম দেখাতে পারে। অতীতে অনেক গবেষক একাধিক আলোক শোষণকারী পদার্থ ব্যবহার করেছেন। তবে সেইগুলি আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি ইলেকট্রন স্থানান্তকরণের মাধ্যমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অধ্যাপক জৈন ও তাঁর সহগবেষকরা বিক্রিয়ামাধ্যমে এমন কিছু নীতি ও অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, সেই অবস্থায় ধাতব ন্যানো-পার্টিক্যাল অনুঘটক একবারে দুটি করে ইলেকট্রন স্থানান্তকরণে সক্ষম। আর এই প্রক্রিয়া আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক-ইলেকট্রন স্থানান্তকরণের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। তাছাড়া দুটি পরমাণুর মধ্যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন তৈরির জন্যও তো দুটিই ইলেকট্রন লাগে! তবে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কেবল দুটি ইলেকট্রন হলেই চলবে না, ওদের প্রশমিত করার জন্য দুটি প্রোটনের (প্রকৃতপক্ষে দুটি ধনাত্মক আধান) যোগান থাকাও জরুরী। তা না হলে তৈরী হবে অত্যন্ত সক্রিয় মুক্তমুলক (free radical), যারা বিপরীত বিক্রিয়া ঘটাতেও পিছপা হয় না। ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটবে। এমনকি অনুঘটকের কার্যক্ষমতাও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অধ্যাপক জৈন ও তাঁর সহগবেষকরা গোল্ড ন্যানোপার্টিক্যালের উপস্থিতিতে মাল্টিইলেকট্রন, মাল্টিপ্রোটন স্থানান্তকরণের নীতি অবলম্বন করেই তাঁদের গবেষণাগারে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ইথেন (দুই কার্বনযুক্ত সরলতম সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন) তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন, যা হাইড্রোকার্বন জ্বালানী হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ওঁদের আশা এভাবেই একদিন প্রোপেন এবং বিউটেনের মতো তিন বা চার কার্বনযুক্ত সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (যেগুলি LPG-এর প্রধান উপাদান) তৈরী হবে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য দায়ী বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বদলে যাবে ব্যবহার উপযোগী গ্যাসীয় জ্বালানীতে।

অধ্যাপক জৈন মনে করেন হয়তো আগামী এক দশকের মধ্যেই আরো অনেক এগোবে গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা। যখন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিবন্ধকরণ (fixation)-এর পর তা থেকে জ্বালানী উৎপাদন, এই পুরো প্রক্রিয়াটাই সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনীতির সাপেক্ষেও হয়ে উঠবে গ্রহণযোগ্য। তবে একথাও ঠিক যে এই লক্ষ্যে এখনো অনেক পথ চলা বাকি।

তথ্যসূত্র : *Nature Chemistry (2018), doi : 10.1038/s41557-018-0054-3*

M : 9434377067, e-mail : acnbu13@gmail.com

সি দ্ধা র্থ জো য়া র দা র

‘নিপাহ্’ ছড়াতে ফলাহারী বাদুড় কতটা দায়ী?

খবরের কাগজ ও টিভি-র দৌলতে সম্প্রতি জনমানসে এক অদ্ভুত আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকেই ফল খাওয়া এড়িয়ে চলছেন। অথচ এই ফলের মরশুমে বাজারে এখন হরেক রকমের ফল। ফলের ব্যবসায় তাই এই সময়ে ব্যাপক আকারে না হলেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে, বৈকি! অথচ আমাদের এই ফল খাওয়াকে এড়িয়ে চলাটা একেবারেই কিন্তু যুক্তিসংগত ও বাস্তব বুদ্ধিসম্মত নয়। ‘নিপাহ্’ ভাইরাসের সঙ্গে ফলাহারী বাদুড়-এর একটা যোগ আছে। সেটা সত্যি হলেও ফলের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমণের তত্ত্ব আজ অবধি কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। বরং নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তারের রূপরেখা কোন্‌টি, এই প্রশ্নে কিছুটা হতবুদ্ধি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছেন বিশ্বের আপামর বিজ্ঞানীমহল। এর কারণ হল—১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বরে প্রথমবার মালেশিয়ায় সংক্রমণের ঘটনা নজরে আসবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কয়বার সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রতিবারই কোনও বিশেষ ‘একটি’ কারণ দেখা যায়নি। প্রথম ঘটনায় শূকরের সংক্রমণ যেমন নজরে এসেছে, পরবর্তীতে ভাইরাস সংক্রামিত খেজুরের রস ও বাদুড়ের উপস্থিতি দেখা গেছে বাংলাদেশ (২০০১ সালে) ও নদীয়া (২০০৭ সালে)-র ঘটনায়, আবার শিলিগুড়ির ঘটনায় (২০০১ সালে) এগুলো কিছুই তেমনভাবে নজরে আসেনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষের মধ্যে রোগের সংক্রমণ দেখা গেছে এবং মানুষ থেকে মানুষে তা ছাড়িয়েছে। এবারের কেরালার ঘটনায় বাদুড়ের সংযোগ (উপস্থিতি) আপাতভাবে নজরে এলেও, সেই সমস্ত বাদুড়ের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি বা নিপাহ্ ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরী হওয়া অ্যান্টিবডির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফলে এবারও রোগ ছড়ানোর নির্দিষ্ট কোনও কারণকে চিহ্নিত করা যায় নি।

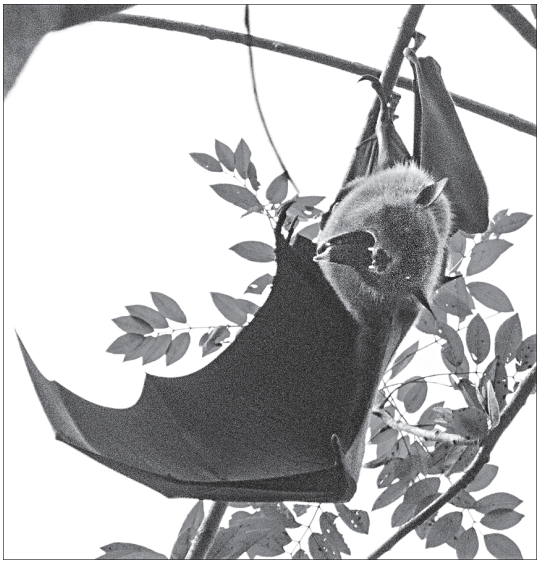

ছবি : তাপস মজুমদার

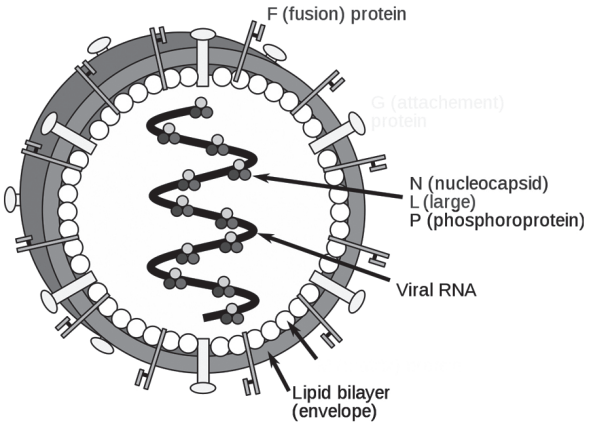

নিপা ভাইরাস

নিপাহ্ ভাইরাসজনিত রোগটির প্রকৃতি আলোচনা করলে বিষয়টা বোধ করি একটু পরিষ্কার হবে। নিপাহ্ (Nipah) ভাইরাস সম্পর্কে প্রথম জানা যায় মালোশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ‘নেগেরি সেম্‌বিলান’ জেলার ‘ক্যাম্‌পাঙ্গ সাঙ্গাই নিপাহ্’ নামক গ্রামে শূকর খামারীদের অজানা জ্বরে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের সুবাদে। তখন শূকর ও মানুষের (খামারীদের) দেহে এক নতুন ধরনের ভাইরাস পাওয়া যায়, যা ‘হেন্ড্রা’ নামক ‘প্যারামিক্সো’ জাতীয় একধরনের আর এন এ ভাইরাসের দোসর। ১৯৯৪ সালে এই হেন্ড্রাভাইরাস মিলেছিল অস্ট্রেলিয়ার ‘ব্রিস্‌বেন’ শহরের অদূরে ‘হন্ড্রা’ নামক জায়গায়। একসাথে ঘোড়া ও মানুষের শরীরে। নতুন ভাইরাসটি ও হেন্ড্রা ভাইরাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানালেন, মালেশিয়ায় খোঁজ পাওয়া নতুন ভাইরাসটি পুরোপুরি হেন্ড্রা ভাইরাসের মত নয়। এটি একটি নতুন প্রজাতির ভাইরাস। নাম দেওয়া হল—‘নিপাহ্’ (গ্রামটির নাম থেকে)। আর ভাইরাসের জেনাস করা হল—হেনিপাহ্ (হেন্ড্রা ও নিপাহ্-র সমন্বয়ে)।

নিপাহ্ ভীষণ মারাত্মক ও মানুষে ছোঁয়াচে রোগ সৃষ্টিকারী একটি ভাইরাস। মস্তিষ্কের প্রদাহ (এন্‌কেফেলাইটিস) তৈরী করে বলে মাথা যন্ত্রণা, ঝিমুনী, জ্বরে ভুল বকা, স্মৃতিলোপ পাওয়া, পরের দিকে খিঁচুনী ও মৃত্যুর আগে কোমায় চলে যাওয়া এই সংক্রমণের রোগ-লক্ষণ। লালারস, ঘাম, মুত্র ও অন্যান্য দেহ-নিঃসৃত জলীয় পদার্থের মাধ্যমে এই ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর থেকে বেরিয়ে আসায় তার সংস্পর্শে থাকা মানুষেরা সহজেই আক্রান্ত হন। এইভাবে দ্রুত রোগ ছড়ায় বলে রোগের মড়ক তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোঁয়াচে ও ভীষণ ক্ষতিকর (প্রাণঘাতী) বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘বায়ো-সেফটি লেভেল ফোর’ রোগজীবাণুর তালিকায় এই ভাইরাসকে রেখেছে। এই তালিকায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইবোলা, সার্স, জিকা প্রভৃতি উঠতি ত্রাস সৃষ্টিকারী ভাইরাসরা রয়েছে।

এখন পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী, নিপাহ্ ভাইরাস মানুষে রোগবিস্তার করে তার মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে; অথচ বাদুড়সহ বেশ কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে। এমনকি, এদের দেহে কোনও রোগলক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। গরু, ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে এই অদ্ভুত বিশেষত্ব চোখে

পড়েছে। ফলাহারী বাদুড়ের বেশ কয়েকটি প্রজাতি নিপাহ্ ভাইরাসের স্বাভাবিক পোষক (ন্যাচারাল হোস্ট)। এদের মধ্যে একটি অদ্ভুত পারস্পরিক সখ্যতা লক্ষ করা গেছে। বাদুড় তার অধিক রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার বলে একদিকে যেমন নিপাহ্ ভাইরাসকে ঠেকিয়ে রাখে, রোগ সৃষ্টি করতে দেয় না; তেমনি এই ভাইরাসও বাদুড়ের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাকে (ইমিউন সিস্টেমকে) পাশ কাটিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাদুড়ের দেহে বজায় রাখে ও বংশ বিস্তার করে। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে দুপক্ষের স্বার্থ চরিতার্থ হয়। কিন্তু সবকিছু গোল বাধে বাদুড়ের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দ-পতন ঘটলে। বাদুড় খাদ্য ও বাসস্থানের স্বল্পতাজনিত কারণে চাপে (স্ট্রেস) থাকলে তার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা কমে যায়, ফলে তার দেহে ভাইরাসের সংখ্যা বেড়ে যায়। সংখ্যাবৃদ্ধি হয় বলে ভাইরাস বাদুড়ের দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্য পোষকের খোঁজে। একে পরিভাষায় বলে 'স্পীল ওভার' (উপচে পড়া)। এই স্পীল ওভারই যাবতীয় সমস্যার মূলে। বাদুড়ের লালারস, ঘাম ও মূত্রের মধ্যে দিয়ে দেহের বাইরে বেড়িয়ে আসে। এইসময় অন্তবর্তী পোষক (ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট) এবং মানুষে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। শূকর হল ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। বাদুড়ের মুখ দেওয়া খেজুর ও তালের রস বা ফল তখন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম হতে পারে।

উপযুক্ত ওষুধ ও টীকা এখনও না তৈরি হওয়ায় নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে। তবে উপায়? ভাইরাস-সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন জন-স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা। যথাসম্ভব ভাইরাসের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের।

নূন্যতম কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই তা সম্ভব। গৃহপালিত পশুর পরিচর্যার পর ভাল করে সাবান জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে। খেজুর ও তালের রস সরাসরি না খেয়ে অন্তত আধঘণ্টা রৌদ্রে রেখে অথবা ফুটিয়ে তার পরে খেতে হবে। যে কোনও জিনিস খাবার আগে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। সেটা সাবান জলে হলেই ভাল। জলে না-ধুয়ে ফল খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করতে হবে। মাটিতে পড়ে থাকা ফল বা 'কিছুটা খাওয়া' ফল পরিহার করা উচিত। বাজারে থেকে কেনা ফল বা গাছের টাটকা ফলকে ধুয়ে খেতে হবে। খুব ভাল হয়, ফলগুলোকে ৩-৫ মিনিট নুন জলে (১ লিটার জলে আধ চামচ নুন) ডুবিয়ে, পরে সাধারণ জলে ভাল করে ধুয়ে নিলে। তাতে নোনতা-স্বাদ আর থাকবে না। জীবাণু ও ভাইরাস নোনা-জলে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

M : 9231533335, e-mail : joardar69@gmail.com

ত প ন দা স

অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল—আমরা কতটা লাভবান?

২০০৫ সালে মুক্তি পাওয়া অমিতাভ বচ্চন ও রানী মুখার্জীর ব্ল্যাক সিনেমায় মাস্টার মশাই অমিতাভ অ্যালজাইমার নামক অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। এই অসুখে আক্রান্ত মানুষের স্মৃতি শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। আজকাল প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন অসুখের নাম আমরা জানতে পারি, যাদের মধ্যে কোনো কোনো রোগের কারণ তো এখনো বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি।

আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি চট করে হাতের কাছে পাওয়া যায়, এমন সমস্ত জিনিসের উপর। আবার অন্যদিকে আমরা দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছি চিরাচরিত ব্যবহৃত জিনিস পত্র। কাঁচ, মাটি অথবা পোর্সিলিনের জায়গায় আজ আমরা ব্যবহার করছি প্লাসটিকের জিনিস। আজকাল হামেশাই রেস্তোরাঁ থেকে গরম গরম বিরিয়ানি বা চিকেন চাপ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে করে আমরা বাড়িতে নিয়ে যাই। কখনো আবার মোটা প্লাস্টিকের উপর অ্যালুমিনিয়াম আস্তরন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার সংরক্ষণ করছি।

বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া এবং জলীয় বাষ্পের হাত থেকে খাদ্য দ্রব্যকে সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল একটি অন্যতম উপায়। খাদ্য দ্রব্যকে সংরক্ষণ ছাড়াও প্রসাধন সামগ্রী এবং রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু না জেনে যে কোনো ধরনের জিনিস দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ কী?

আমরা অনেক খাবারই অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে গরম করি বা কখনো দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করি। বিশেষ করে গরম খাবার, টমেটো বা যেকোনো সাইট্রাস জাতীয় খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে রাখলে ফয়েল থেকে ক্ষরণের ফলে অ্যালুমিনিয়াম খাবারে মিশে যায় যা আমাদের রক্তে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, মস্তিষ্কের কোষে জমতে থাকে অ্যালুমিনিয়াম। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন অ্যালজাইমার রোগের একটি সম্ভাব্য কারণ। গবেষকেরা এও প্রমাণ করেছেন রক্তে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে অসটিওপোরেসিস হতে পারে। রক্তে হঠাৎ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণ অ্যালুমিনিয়ামও হতে পারে। কারণ অ্যালুমিনিয়াম ক্যালসিয়ামের আগে রক্তে শোষিত হয়। ফল স্বরূপ প্যারাথাইরয়েড হরমোন ক্ষরণ অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়, যার থেকে ওসটিওপোরেসিস রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই রোগের প্রভাবে মানুষের হাড় দুর্বল হতে থাকে। অনেকে কিডনীর কিছু রোগের জন্যও অ্যালুমিনিয়ামকে দায়ী করেছেন।

তাই আমরা আমাদের হাড় ও মস্তিষ্ককে সতেজ রাখতে চাইলে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহারে কয়েকটি সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন গরম খাবার কখনোই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে রাখা যাবে না, কারণ উচ্চ উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম ক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন কোনো খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে রাখা যাবে না। তাছাড়া টমেটো সস বা সাইট্রাস জাতীয় খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে না রাখাই ভালো কারণ এই জাতীয় খাবারে উপস্থিত অ্যাসকরবিক অ্যাসিড খুব সহজে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে খাবারটিকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। তাই নিজেদেরকে সুস্থ রাখার জন্য বুঝে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করুন।

M : 9434686749, e-mail : tdcob25@gmail.com

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

মাদারি কা খেল

গ্রামের মেলায় মাদারির খেলা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে একটা শো মাঝেমাঝেই দেখানো হয়, যেখানে দশ-বারো ফুট দূরত্বে মাটিতে পোঁতা দুটো বাঁশের খুঁটিতে খুব শক্ত করে একটা দড়িকে অনুভূমিকভাবে বেধে দেওয়া হয়। আর একজন লোক হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে দড়ির একদিক থেকে আরেকদিকে হেঁটে যান। সামান্য একটু অসতর্ক হলেই কিন্তু তিনি উঁচু থেকে সোজা মাটিতে এসে পড়বেন। অথচ দিনের পর দিন তিনি অবলীলায় এ কাজটা করে যান। প্রশ্ন হল ঐরকম একটা সরু দড়ির উপর কীভাবে ব্যালান্স রাখেন তারা? কী তাদের টেকনিক? আজকে বরং সে ব্যাপারটা নিয়েই একটু আলোচনা করা যাক।

ছবি : তাপস মজুমদার

তাদের সেই কসরতে যে অভ্যাসের একটা ব্যাপার আছে সে নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু তার সাথে সাথে বিজ্ঞানের কায়দা-কানুনও আছে। দড়িটাকে যে শক্ত করে বাঁধতে হবে সেটা আগেই বলেছি। বাঁধনটা শক্তপোক্ত না হলে ব্যালান্স রাখা কঠিন হবে। তবে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল শরীরের ভারকেন্দ্রটাকে দড়ির দিকে নামিয়ে আনা। ভারকেন্দ্র হল সেই বিন্দু যার মধ্যে দিয়ে কোনও বস্তুর ওজন সোজা নীচের দিকে নেমে আসে। তবে তার জন্য সামনে ঝুঁকে গেলে কিন্তু চলবে না, তাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে, শুধু হাঁটুদুটোকে একটু ভাঁজ করে উরুর অংশটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে। তাহলেই শরীরের ভারকেন্দ্র দড়ির কাছাকাছি চলে আসবে। আর ভারকেন্দ্রটা নীচের দিকে নেমে এলেই ব্যালান্স রাখাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ঠিক একই কারণে একটা লম্বা সরু ফুলদানী সহজেই উলটে যায়, কিন্তু একটা ভারী ফুলদানী সহজে উল্টায় না।

কিন্তু দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার আরেকটা বিপদ হল, দড়ির উপরে পা ফেললেই দড়িটা ঘুরে যেতে চায়। সুতরাং পতন অনিবার্য। অতঃ কিম্? তার জন্য আছে হাতের লম্বা লাঠিটা। আমরা দেখি একটা বস্তুকে ঠেলে সরাতে চাইলে সে বাধা দেয়। একে বলে তার জাড্য, আর এই জাড্যকে মাপা যায় তার ভর দিয়ে। ঠিক সেরকমই কোনও বস্তুকে কোনও একটা অক্ষের চারদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলেও সে বাধা দিতে চায়। একে মাপা হয় তার জাড্য ভ্রামক দিয়ে। জাড্য ভ্রামক হল বস্তুর ভর আর অক্ষ থেকে তার দূরত্বের বর্গের গুণফল। এই জাড্য ভ্রামক যত বেশি হয়, বস্তু তত আস্তে আস্তে ঘোরে। এক্ষেত্রে লম্বা লাঠিটা ব্যক্তির শরীর থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, তাই জাড্য-ভ্রামকও অনেকটা বেড়ে যায়। ফলে শরীরটা সাম্যাবস্থা থেকে সামান্য একটু ঘুরে গেলেও সেটা হবে খুব আস্তে আস্তে। ফলে সাম্যাবস্থায় ফিরে আসার জন্য তিনি অনেকটাই সময় পেয়ে যান। তাছাড়া লাঠির শেষ প্রান্ত দুটো মাটির দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকে বলে ভারকেন্দ্র নীচে নেমে আসার কাজটাও কিছুটা সহজ হয়ে যায়।

সুরজিত ঘোষ

গোল্ডবাখ সংখ্যা

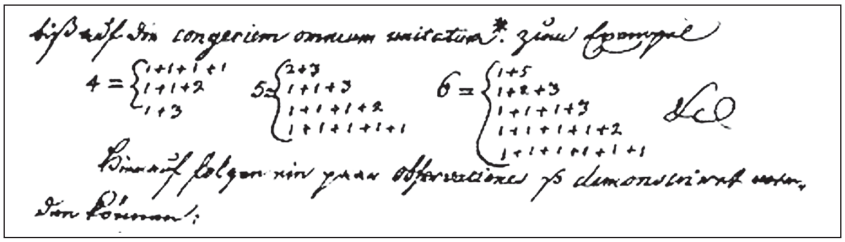

যে সব সংখ্যাকে দুটি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে প্রকাশ করা যায় তাদের গোল্ডবাখ সংখ্যা বলে। গোল্ডবাখের অনুমানকে এভাবেও বিবৃত করা যায়—'২ এর থেকে বড় সকল জোড় পূর্ণ সংখ্যাই গোল্ডবাখ সংখ্যা।' কোনো জোড় সংখ্যাকে ২টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল দ্বারা প্রকাশ করলে সেটাকে বলা হয় সংখ্যাটির গোল্ডবাখ বিভাজক (ইংরেজিতে Goldbach partition)। যেমন : ৪ = ২ + ২, ১০ = ৩ + ৭ বা ৫ + ৫। ১৭৪২ সালে ৭ জুন জার্মান গণিতবিদ গোল্ডবাখ তার বন্ধু গণিতবিদ লেওনার্ড আয়লারকে চিঠি লেখেন যেখানে তিনি বলেন যেকোন সংখ্যাকে দুইটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা যায়, যতগুলো ইচ্ছা মৌলিক সংখ্যার যোগফল হিসাবেও লেখা যায় যতক্ষণ না সবগুলো সংখ্যা ১ হয়। পরে তিনি ২য় আরেকটি অনুমান প্রস্তাবনা করেন চিঠির মার্জিনের পাশে : ২-এর চেয়ে বড় যেকোন জোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ২টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা যায়। গোল্ডবাখ ১কে মৌলিক সংখ্যা হিসাবে ধরেছিলেন যেটা এখন আর গণিতে ধরা হয় না। দুটি অনুমানকেই এখন একই ধরা হয়। মার্জিনের পাশের অনুমানের আধুনিক সংস্করণ হলো ৫-এর চেয়ে বড় বিজোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ৩টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা যায়। অয়লার ১৭৪২ সালের ৩০ জুন চিঠির উত্তর দেন এবং তার চিঠিতে বলেন : দুই-এর চেয়ে বড় যেকোন জোড় পূর্ণ সংখ্যাকে দুইটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা যায়। আমি এটাকে একটি উপপাদ্য মনে করি যদিও আমি এটা প্রমাণ করতে পারিনি।

প্রমাণ : যে কোন জোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ২টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল/বিজোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ৩টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা যায়।

ধরা যাক P একটি মৌলিক সংখ্যা, আমরা জানি $(p + 2)^2 = p^2 + 4p + 4 = 2 + p^2 + 4p + 2$

এখানে বামপক্ষ একটি বিজোড় সংখ্যা আর ডানপক্ষ ২টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল কারণ p2 + 4p + 2 কে বিভাজন করা যাবে না। আমরা জানি মৌলিক সংখ্যা অন্তহীন। এই অন্তহীন মৌলিক সংখ্যার থেকে ২ কম এমন অন্তহীন বিজোড় সংখ্যাও অন্তহীন। এরকম একটি বিজোড় সংখ্যা R যদি উভয়পক্ষে যোগ করা হয় তবে বামপক্ষ একটি জোড় সংখ্যায় পরিণত হবে আর ডানপক্ষ ২টি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে লেখা যাবে কারণ p2 + 4p + 2 কে বিভাজন করা যাবে না এবং সংজ্ঞানুযায়ী R + 2 একটি বিজোড় মৌলিক সংখ্যা। $(p + 2)^2 = R = (R + 2) + (p^2 + 4p + 2)$ এই সমীকরণটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল এর আদর্শ সমীকরণ। এই সমীকরণটিতে 4P-কে ভেঙে 2P + 2P ও P = 2 (সর্বনিম্ন এবং একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা) বসিয়ে পাই 2 + 2 + 2 + 2 এবং 4কে ভেঙে 2 + 2 লেখা যায়। এই ছয়টি মুক্ত জোড় সংখ্যাই কোন বিজোড় সংখ্যার সহিত যুক্ত হয়ে সর্বাধিক ৬ টি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ হতে পারে এবং যোগফলটি একটি জোড় সংখ্যা হবে। একইভাবে একটি জোড় সংখ্যাকে ৩ টি ও ৬ টি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপেও লেখা যাবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আদর্শ সমীকরণটি কি অসীম পর্যন্ত জোড় বা বিজোড় সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করতে পারে? 2P, 2P, 2 এই রাশিগুলিতে P = 2 (সর্বনিম্ন মৌলিক সংখ্যা) বসিয়ে তাদের অনুপাত নিয়ে পাই 4:4:2 = 2:2:1। এই অনুপাতটি একটি সার্বজনীন অনুপাত, এই অনুপাতের সংখ্যার দ্বারা যেকোনো সংখ্যা গড়া যায় বলে সাধারণ তুলাদণ্ডে ওজন বাটখারা গুলি এই অনুপাতে নেওয়া হয়। যেহেতু মৌলিক সংখ্যার যোগফল এর আদর্শ সমীকরণটি অসীমের দিকে খোলা বিজোড় মৌলিক সংখ্যাগুলি 1+1=2, 2+2=4, 4+2=6 সমবায়ে (ইংরেজিতে Combination) যুক্ত হয়ে 4 এর বেশি জোড় সংখ্যাকে যথাক্রমে ২টি, ৪টি ও ৬টি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করতে পারে। 4কেও মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে লেখা যাবে 4=2+2। একইভাবে বিজোড় মৌলিক সংখ্যা গুলি 2+1=3, 3+3=6 সমবায়ে যুক্ত হয়ে ৭-এর বেশি বিজোড় সংখ্যাকে যথাক্রমে ৩টি ও ৬টি বিজোড় মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করতে পারে। 7-কেও মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে লেখা যাবে 7=3+2+2। সবমিলিয়ে গোল্ডবাখ অনুমান সত্য প্রমাণিত।

[৪ থেকে ১০০ অবধি জোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ২টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লিখে দিলাম, তোমরা অন্যভাবে লেখার চেষ্টা কর। ২+২=৪, ৩+৩=৬, ৫+৩=৮, ৭+৩=১০, ৭+৫=১২, ১১+৩=১৪, ১৩+৩=১৬, ১৩+৫=১৮, ১৭+৩=২০, ১৯+৩=২২, ১৯+৫=২৪, ১৯+৭=২৬, ২৩+৫=২৮, ২৩+৭=৩০, ২৯+৩=৩২, ৩১+৩=৩৪, ৩১+৫=৩৬, ৩১+৭=৩৮, ৩৭+৩=৪০, ৩৭+৫=৪২, ৪১+৩=৪৪, ৪৩+৩=৪৬, ৪৩+৫=৪৮, ৪৭+৩=৫০, ৪৭+৫=৫২, ৪৭+৭=৫৪, ৫৩+৩=৫৬, ৫৩+৫=৫৮, ৫৩+৭=৬০, ৫৯+৩=৬২, ৫৯+৫=৬৪, ৬১+৫=৬৬, ৬১+৭=৬৮, ৬৭+৩=৭০, ৬৭+৫=৭২, ৭১+৩=৭৪, ৭৩+৩=৭৬, ৭৩+৫=৭৮, ৭৩+৭=৮০, ৭৯+৩=৮২, ৭৯+৫=৮৪, ৮৩+৩=৮৬, ৮৩+৫=৮৮, ৮৩+৭=৯০, ৮৯+৩=৯২, ৮৯+৫=৯৪, ৮৯+৭=৯৬, ৭৯+১৯=৯৮, ৯৭+৩=১০০. ৭ থেকে ১০০ অবধি বিজোড় পূর্ণ সংখ্যাকে ৩টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে নিজেরা লেখার চেষ্টা কর। একটু ধৈর্য নিয়ে ১০০০ পর্যন্ত জোড়/বিজোড় পূর্ণ সংখ্যাকে যথাক্রকে ২টি/৩টি মৌলিক সংখ্যার যোগফল আকারে লেখার চেষ্টা কর।

M : 8777677384, e-mail : surajit.ghosh@yahoo.com

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

কথার মধ্যে নানা কুসংস্কার

ভাষা সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ তখনকার জ্ঞান, বিশ্বাস, ধারণা অনুযায়ী নানা শব্দ বা অভিভাষার সৃষ্টি করেছে। সময়ের সঙ্গে তা পাল্টেছে, কিছু হারিয়ে গেছে, কিছু নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। এখন যেগুলো মিথ্যা বিশ্বাস কিংবা কুসংস্কার বলে জানা গেছে, এখনো ঐসব অনেক শব্দের ব্যবহার টিকে আছে।

যেমন ধরা যাক পয়া-অপয়া, শুভ-অশুভ, ভাগ্য-কপাল, ইহলোক-পরলোক ইত্যাদি কথাগুলি। বিশেষ কেউ বা কিছু ঐভাবে পয়া বা অপয়া হতে পারে না, শুভ বা অশুভ সময় বলেও কিছু নেই, ভাগ্য বা কপালের জোরে কিছু ঘটে না, ইহলোক-পরলোক বলেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবু এখনো বহুজনই এসবে বিশ্বাস করে। তারা তো বটেই, যারা অন্ধভাবে এসব মানেন না, তারাও আলগোছে কথার মধ্যে এসব ব্যবহার করে যান। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে, যাত্রাটাই অশুভ ছিল, কপালজোরে অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে গেছি, উনি আজ সকালে ইহলোক ত্যাগ করলেন বা পরলোক গমন করলেন ইত্যাদি কথা হামেশাই ব্যবহৃত হয়। যাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন করেন ও বিজ্ঞান মনস্কতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের উচিত সচেতনভাবেই এই সব কথাবার্তা পরিহার করা।

যাইহোক, অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এখনো এমন অনেক পরিভাষা রয়েছে, তা পুরনো ধ্যানধারণার প্রতিফলন হিসেবে, এমনকি পৌরানিক গল্পগাথা কল্পনার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং টিকে আছে।

যেমন ধরা যাক 'হিস্টেরিয়া' শব্দটি। এটি একধরনের মানসিক ও আচরণগত বৈকল্য। এতে খিঁচুনি হতে পারে, কিন্তু তা মৃগীর মত মস্তিষ্কের কোন রোগ নয়। মনের গভীরে থাকা কোন অতৃপ্তি বা হতাশা কিংবা পলায়নীমনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে, আরো নানা আপাত অসুস্থতা দেখা দেয়। এটি বেশি ঘটে মেয়েদের। আগে ভাবা হত মেয়েদের জরায়ু বা ইউটেরাস উত্তেজিত হয়ে গেলে এটি হয়। গ্রীক শব্দ 'হিস্টেরস'-এর অর্থ জরায়ু। এখন এটি স্পষ্টভাবে জানা গেছে, জরায়ুর সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক নেই। তবু 'হিস্টেরিয়া' কথাটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে থেকে গেছে, যদিও সম্প্রতি একে অন্য ধরনের নামেও চিহ্নিত করা হয়।

আরেকটি শব্দ, যেমন ম্যালেরিয়া। আগে ভাবা হত 'ম্যাল' 'এয়ার' অর্থাৎ খারাপ বাতাসের জন্য এটি হয়। তখন এর সঙ্গে মশা, প্লাজমোডিয়াম পরজীবীর সম্পর্ক এসব জানা ছিল না। মাত্র একশ দশ-কুড়ি বছর আগে এসব জানা যায়। তবু খারাপ বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে এর ম্যালেরিয়া নামটি থেকে গেছে।

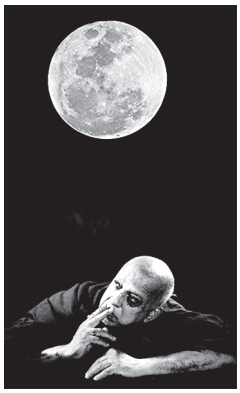

মনোবৈকল্যের বিশেষ কিছু অবস্থার রোগি বা তথাকথিত পাগলদের বোঝাতে লুনাটিক কথাটি ব্যবহৃত হয় (যেমন লুনাটিক অ্যাসাইলাম)। আগে ভাবা হত চাঁদের প্রভাবে কিছু মানুষ পাগল হয়ে যায়। ল্যাটিনে চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুকে বোঝাতে লুনাটিক বা লুনার কথাটি ব্যবহৃত হয়। (যেমন লুনার এক্লিপ্স্ বা চন্দ্রগ্রহণ)। এখন তো এটি স্পষ্ট যে চাঁদের সঙ্গে মনোবৈকল্যের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যের আলোর তুলনায় চাঁদের আলোর আলোআধারি রহস্যময়তা, প্রতি রাতের পরিবর্তন,—এসবের জন্যই হয়তো এই ধরনের কল্পনার সৃষ্টি। (বাংলা বা সংস্কৃতে যেমন 'চন্দ্রাহত')

একইভাবে এসেছে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' শব্দটি। আগে তো এর পেছনে ভাইরাসের আক্রমণের কথা জানা ছিল না। ভাবা হত কোন অপশক্তির প্রভাবে বা ইনফ্লুয়েন্স-এ ঐভাবে হঠাৎ জ্বর, সর্দি, গা হাত ব্যথা শুরু হয়।

পায়ে গোড়ালির পেছনে শক্ত দড়ির মত যে টেন্ডনটি থাকে (টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস), তাকে একিলিস টেন্ডন নামেও ডাকা হয়। এটি যদি কোনভাবে কেটে যায় তবে আমরা হাঁটতে বা ছুটতে পারব না। গ্রীক বীর একিলিস-এর জন্মের পর তার মা তাকে স্টিক্স নদীর জলে ডুবিয়ে দেন। এই জল শরীরের যেখানে লাগবে সেখানে কোন অস্ত্র আঘাত করতে পারবে না। মুশকিল হচ্ছে, নদীতে ডোবানোর সময় মা একিলিসকে ধরেছিলেন গোড়ালির কাছটায়। অর্থাৎ তার মা নীচের দিকে করে নদীতে ডুবিয়েই তুলে নেন। ফলে একিলিসের শরীরের সব জায়গায় ঐ জল লাগলেও গোড়ালির ঐ টেন্ডনের কাছটায় আর লাগেনি। বড় হয়ে একিলিসকে কেউই হারাতে পারত না, কারণ তার শরীরে তো কোন অস্ত্র আঘাত করতে পারে না। শেষ অব্দি তার প্রতিপক্ষ একসময় টেন্ডনের ঐ দুর্বলতার কথা জানতে পারে। ঐখানে তীর মেরে তা কেটে দেয়, ফলে একিলিস আর ছুটতে-চলতে পারল না, পরাজিত হল। ঐভাবে জলের যে কোন অলৌকিক গুণ থাকতে পারে না, তা আমরা জানি। তবু সুন্দর একটি পৌরাণিক গল্পের ছায়া আধুনিক শারীরবিজ্ঞানেও থেকে গেছে।

M : 9733400443, e-mail : sahoo2331953@gmail.com

অ জ য় না থ

বজ্রপাতে মৃত্যু—বাঁচব কী ভাবে

গত কয়েক বছর বাজ পড়ে মারা যাওয়ার খবর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শিরোনামে উঠে আসছে। প্রতি গ্রীষ্মে তীব্র থেকে তীব্রতর বাজ পড়ার ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। বাজ পড়ে মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে ঘরের ভেতরে থাকা সিলিং ফ্যান, ফ্রিজ, টিভি, এসি, ইনভারটার প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? একে কী ভাবে প্রতিহত করা যায় বা আদৌ প্রতিহত করা যায় কী না এই সব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। সাম্প্রতিক বছরগুলির তুলনায় ২০১৮ সালে বজ্রপাতের ঘটনা যে অনেকটা বেড়েছে সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এই সব কারণ অনুসন্ধান করার আগে এটা জেনে নেওয়া ভাল বজ্রপাত ঠিক কাকে বলে?

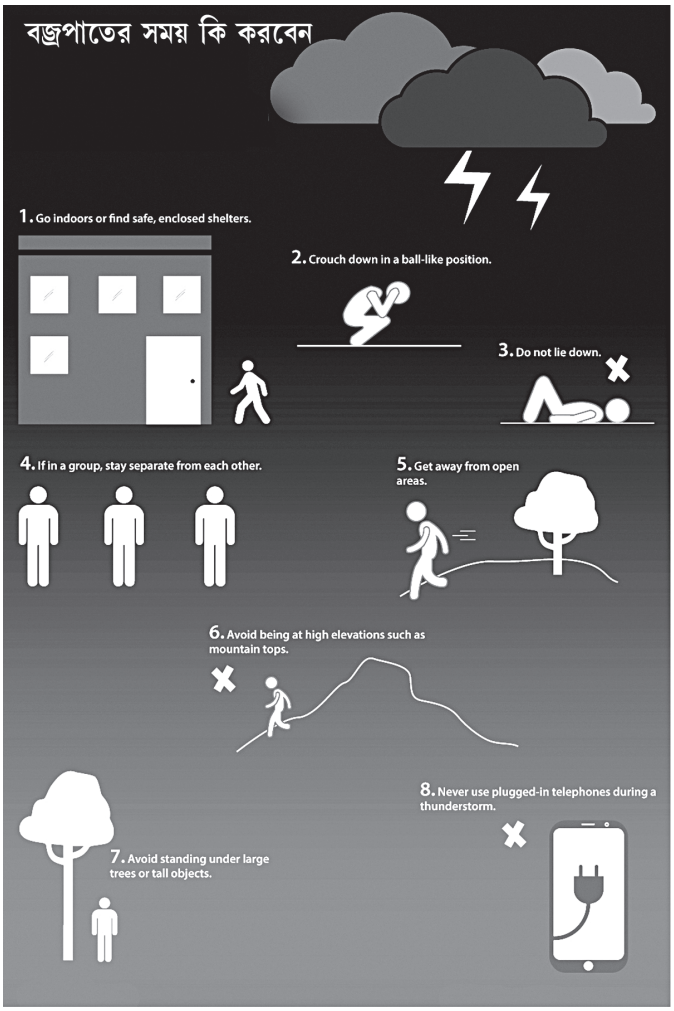

সহজ ভাবে বললে বজ্রপাত যাকে ইংরাজীতে Lightning বলে তা হল মেঘের মধ্যে জমতে থাকা বিপুল পরিমাণের তড়িৎ শক্তি মেঘের ভেতর থেকে বের হয়ে আসা। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই চোখ ঝলসানো আলোর ঝলক ও শুনতে পাই প্রচণ্ড জোরে শব্দ। এই আলোর ঝলককে আমরা কাব্য করে বলি বিজুরি বা দামিনী আর শব্দকে বলি মেঘগর্জন। এই বিপুল পরিমাণ তড়িৎ শক্তি মেঘ থেকে বেরিয়ে ৮ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত ছুটে আসতে পারে। বাতাসের তাপমাত্র ২৭৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ও জমে থাকা বিদ্যুতের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি বছর বাজ পড়ে গোটা পৃথিবীতে আহত হন প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ তার ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় চব্বিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। বজ্রাহত মানুষের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকেন। বাকি ২০ শতাংশের আঘাত তেমন গুরুতর হয় না। ভারতে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর গড় বছরে ১৭৫৫ জন।

কম তাপমাত্রার জন্য অতিশীতল (super-cooled) মেঘ কণা, ক্ষুদ্র বরফ কণা উপরের দিকে উঠতে থাকে। অপেক্ষাকৃত ভারী ও ঘন নরম শিলা নীচের দিকে নামতে চেষ্টা করে। ফলে মেঘ ও বরফ কণার সাথে নরম শিলার ঘর্ষণ হয়। উপরে উঠতে থাকা বরফ কণা ধনাত্মক ও নীচের দিকে নামতে থাকা নরম শিলা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণায় পরিণত হয়। বজ্রমেঘের নীচের স্তরে ঋণাত্মক ও উপরের স্তরে ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণা জমা হয়ে বিপুল পরিমানের বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হয়। এই বিদ্যুৎশক্তি কখনও মেঘের মধ্যে, কখনও একটি মেঘ থেকে অন্য মেঘের মধ্য পরিচালিত হয়। আবার মাঝে মাঝেই মেঘ থেকে মাটিতে নেমে আসে। মেঘ থেকে মাটিতে নেমে আসা বিদ্যুৎশক্তির আঘাতেই জীবন ও সম্পত্তি হানি হয়। মেঘ থেকে মাটিতে নেমে আসা বিদ্যুৎশক্তি যত তীব্র হয় তার মারণ ক্ষমতাও তত বেশি হয়।

বিগত কয়েক বছর থেকে আমরা ঘনঘন ও তীব্র বজ্রপাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে বড় বড় গাছ, সুউচ্চ বাড়িঘর, জলাভূমি, খোলামাঠ, উঁচু টিলা ইত্যাদির উপরেই বজ্রপাত বেশি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বজ্রপাতকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাই বজ্রপাতের হাত থেকে জীবন ও সম্পত্তিহানি রক্ষা করার জন্য কিছু নিয়ম পালন করতেই হবে। দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ সময়েই অনেকগুলি বজ্রমেঘ একসাথে মিলিত হয়ে ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেঘের সারি তৈরি করে এবং উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বের দিকে সরে আসে। উপগ্রহ ও রাডার চিত্র বিশ্লেষণ করে কখন ও কোন কোন এলাকায় বজ্রপাত হতে পারে তা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তা গণমাধ্যমে প্রচারিতও হয়। সেইদিকে নজর রাখতে হবে। বজ্রপাত শুরু হলে খোলা জায়গা ছেড়ে পাকাবাড়ির ভেতরে আশ্রয় নিতে হবে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। চার্জ দেওয়াও চলবে না। ঘরে যতরকমের বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন যন্ত্র আছে যেমন ফ্রিজ, টিভি, টেবিলফ্যান, এসি কম্প্যুটার ইত্যাদি সবকিছুর প্লাগ খুলে রাখতে হবে। সেটটপ বক্স ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার কেবল সহ সমস্ত রকমের সংযোগ খুলে রাখতে হবে। বড়গাছ বাড়ি ও জলাভূমি থেকে দূরে থাকতে হবে। খোলামাঠে থাকলে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থাকা যাবে না। অনেক মানুষ একসাথে থাকলে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর থেকে বজ্রপাত সম্পর্কে যে সব বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয় সেগুলি মেনে চলতে হবে।

M : 9433802339, e-mail : aknath54@rediffmail.com

মহিলা বিজ্ঞানী-৩

অ নি ন্দ্য দে

জীবন-রহস্যের খোঁজে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন

রোজালিন্ড এলসি ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্ম ১৯২০ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনের নটিং হিল অঞ্চলে। আদর করে কেউ ডাকত রোজ বলে, কেউবা বলত রোজি। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় এই রোজ ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী। ছ'বছর বয়সে যখন তাকে নরল্যান্ড প্লেস স্কুলে পাঠানো হয়, অঙ্কের নেশায় মশগুল ছোট্ট রোজের বিজ্ঞানচর্চার সাধ তখন থেকেই। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে বেশ রুগ্ন। তাই পরিবারের সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় তাকে পাঠানো হল সমুদ্রতীরবর্তী লিন্ডোর্সের বোর্ডিং স্কুলে, তখন তার বয়স নয়। দুবছর পরে তাকে ভর্তি করা হল সেন্ট পল্‌স গার্লস স্কুলে। পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের সাথে সেখানেই তার প্রথম পরিচয়। এর সাথে জার্মান, ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষাতেও যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছিল রোজ। খেলাধুলাতেও তার দারুন আগ্রহ। কিন্তু সমস্যা থেকে গেল সংগীত বিষয়ে। তা সত্ত্বেও ছয়টি বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন ১৯৩৮ সালে। তার সাথে পরবর্তী জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপও পেলেন; তিন বছরের জন্য বার্ষিক ৩০ পাউন্ড আর দাদুর কাছ থেকে পেলেন ৫ পাউন্ড। কিন্তু বাবার কথায় রাজী হয়ে সেই স্কলারশিপের টাকা দান করে দিলেন শরণার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য।

কিন্তু এই পিতাই বাধ সাধলেন তার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও ফ্র্যাঙ্কলিনের বাবা তার পড়াশোনার খরচ চালাতে রাজী হলেন না। শেষে মা-মাসীদের অনেক অনুরোধ-উপরোধে মন গলল বাবার। ফ্র্যাঙ্কলিন ভর্তি হলেন নিউহ্যাম কলেজের রসায়ন বিভাগে। তিন বছর পর সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরনোর পর ফ্র্যাঙ্কলিন যোগ দিলেন গবেষণার কাজে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক রোনাল্ড নরিশের অধীনে। কিন্তু নরিশের নারীবিদ্বেষী মনোভাবে বিরক্ত হয়ে কেমব্রিজ ছাড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন। যোগ দিলেন কয়লার ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণায়। সেখানে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে কয়লার সচ্ছিদ্রতা সম্পর্কে বেশ কিছু হিসেব-নিকেশ করে ফেললেন তিনি। ফলে কয়লার ঘনত্ব মাপার কাজটা বেশ সহজ হয়ে গেল। কয়লার ভেতরের যে ছিদ্রগুলো থাকে সেগুলো আবার জায়গায় জায়গায় বেশ সংকুচিত হয়ে থাকে। এই সংকোচনের সাথে ঐ ছিদ্রপথের ভেদ্যতার একটা সম্পর্কও বের করে ফেললেন ফ্র্যাঙ্কলিন। জ্বালানী হিসেবে কোন জাতের কয়লার যোগ্যতা কতখানি সেটাও নিখুঁতভাবে জানা গেল তার গবেষণা থেকেই। আর তাতেই জুটল ডক্টরেট ডিগ্রী, ১৯৪৫ সালে।

এবার নতুন করে কাজ শুরু করার পালা। ফ্র্যাঙ্কলিন পাড়ি দিলেন ফ্রান্সে, তার প্রিয় শহর প্যারিসে। যোগ দিলেন জাঁক মেরিং-এর গবেষণাগারে। শিখতে শুরু করলেন এক্স-রশ্মির অপবর্তন (X-ray diffraction) সংক্রান্ত কাজকর্ম। এক্স-রশ্মির জন্য কোনও কেলাসকে যে অপবর্তন গ্রেটিং (diffraction grating) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেকথা প্রথম উঠে এসেছিল ১৯১২ সালে পদার্থবিদ্ পিটার এওয়াল্ড আর ম্যাক্স ফন লাও-এর আলোচনা থেকে। সেই কাজের সূত্র ধরে ফন লাও ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কারও পান। কিন্তু যে সব পদার্থ কেলাসাকার নয় অনিয়তকার, তাদের মধ্যে দিয়ে এক্স-রশ্মির অপবর্তন ঘটালে কী হবে? সেটাই দেখতে শুরু করলেন জাঁক মেরিং। পাশে পেলেন ফ্র্যাঙ্কলিনকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফ্র্যাঙ্কলিন কাজ শুরু করলেন কয়লা নিয়ে। বিশেষ করে কয়লা যখন তার রূপ পালটে গ্রাফাইটে পরিণত হয়, তখন তার পারমানবিক সজ্জার কীরকম পরিবর্তন হয় এক্স-রশ্মির অপবর্তনের সাহায্যে সেটাই দেখতে চাইছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। এসময়ে ফ্র্যাঙ্কলিন এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেগুলোকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে কয়লা সম্পর্কিত আধুনিক ধ্যান-ধারনার উৎসমুখ হিসেবে ধরা যেতেই পারে।

১৯৫১ সালে ফ্র্যাঙ্কলিন তিন বছরের বৃত্তি নিয়ে চলে এলেন লন্ডনের কিংস কলেজে। গবেষক হিসেবে যোগ দিলেন মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের জীব-পদার্থবিদ্যা বিভাগে। মুলত প্রোটিন আর লিপিড দ্রবণ নিয়ে এক্স-রশ্মি অপবর্তনের বিষয়গুলোকে খুঁটিয়ে দেখার জন্যই ফ্র্যাঙ্কলিনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে ডি.এন.এ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো জীববিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। তাছাড়া বিষয়টা একেবারে নতুনও বটে। তাই মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের তখনকার ডিরেক্টর জন র‍্যান্ডাল ফ্র্যাঙ্কলিনকে ডি.এন.এ গবেষণায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু সমস্যার সূত্রপাতটা সেখানেই। এক বছর আগে থেকেই সেখানে ছাত্র রেমন্ড গসলিংকে নিয়ে ডি. এন. এ. অনুর উপর এক্স-রশ্মি অপবর্তনের কাজ শুরু করেছিলেন অধ্যাপক মরিস উইলকিন্স। কিন্তু র‍্যান্ডাল যে এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব এবং গসলিং-এর গবেষণার তদারকির ভার ফ্র্যাঙ্কলিনকে দিতে চান, সেকথা উইলকিন্সকে জানান নি। উইলকিন্স তখন কাজের সূত্রে বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে ফ্র্যাঙ্কলিনকে দেখে নতুন একজন সহকারী হিসেবেই তিনি ভেবে

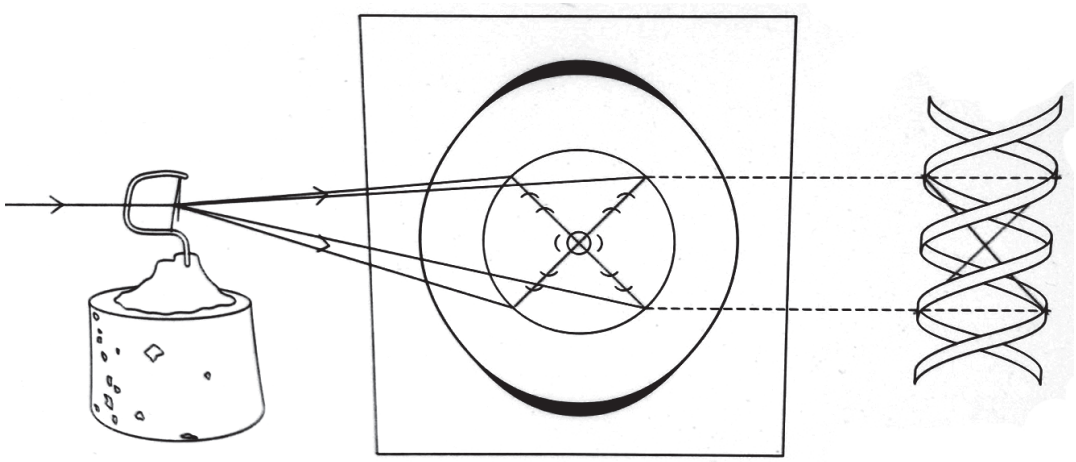

একটি কাগজ ক্লীপে একটি DNA তন্ত্রীকে প্রসারিত করলেন এবং এক টুকরো কর্কে স্থাপন করলেন

DNA তন্ত্রী দিয়ে এক্স-রে পাঠানো হল এবং তাদের অপবর্তন পথ সংবেদনশীল কাগজে ধরা হল। তৈরি হল ফটো-৫১।

ফটো-৫১ এর X তৈরী হল DNA তন্ত্রীর প্যাঁচানো সিড়ির আকারের জন্য

নিয়েছিলেন। ফলে প্রথম থেকেই উইলকিন্স আর ফ্র্যাঙ্কলিনের মধ্যে একটা তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে।

এদিকে ফ্র্যাঙ্কলিন ছাত্র গসলিংকে নিয়ে উইলকিন্সের যন্ত্রপাতিগুলোকে আরও কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা চালাতে শুরু করে দিয়েছেন। রসায়নের জ্ঞানকেও দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন তখন। অথচ এই প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্পর্কে উইলকিন্স যখন তাকে প্রশ্ন করছেন, তখন যেভাবে তিনি উত্তর দিচ্ছেন, উইলকিন্সের ভাষায় তা যেন এক শীতল ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ।

এই তপ্ত বাতাবরণের মধ্যেই ফ্র্যাঙ্কলিন আর গসলিং দেখলেন ভেজা অবস্থায় ডি.এন.এ. তন্তুগুলো কিছুটা লম্বা আর পাতলা থাকে; কিন্তু শুকনো হলেই সেগুলো অনেকটা বেঁটে আর মোটা হয়ে যায়। ফ্র্যাঙ্কলিন তাদের নাম দিলেন 'বি'-টাইপ আর 'এ'-টাইপ ডি.এন.এ.। উইলকিন্স আর ফ্র্যাঙ্কলিনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়াতে ডিরেক্টর র‍্যান্ডাল তখন বুদ্ধি করে সমস্ত গবেষণার বিষয়টাকে দুভাগে ভাগ করে দেন। ফ্র্যাঙ্কলিন বেছে নিলেন 'এ'-টাইপ ডি.এন.এ., আর উইলকিন্স নিলেন 'বি'-টাইপ। সেসময়ে উইলকিন্স 'বি'-টাইপ ডি.এন.এ.-র এমন কিছু ছবি তোলেন যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এদের আকার অনেকটা প্যাঁচানো মই-এর মত। কিন্তু 'এ'-টাইপ ডি.এন.এ.-র গঠন কেমন? সেটা জানা গেল ১৯৫২ সালের মে মাসে। ফ্র্যাঙ্কলিনের গবেষণাগারে তোলা ছবি থেকে বোঝা গেল এর চেহারাও ঐ প্যাঁচানো মই-এর মতই। বিজ্ঞানী মহলে এই ছবি 'ফটোগ্রাফ ৫১' হিসেবেই বেশি পরিচিত।

এদিকে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে 'বি'-টাইপ ডি.এন.এ.-র একটা মডেল তৈরির চেষ্টা শুরু করেন ফ্রান্সিস ক্রিক আর জেম্‌স ওয়াটসন। তারা মূলত ফ্র্যাঙ্কলিন আর উইলকিন্সের সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই মডেল তৈরির কাজটা শুরু করতে চাইছিলেন। তাই সবাই মিলে একসাথে কাজ করার প্রস্তাব নিয়ে ওয়াটসন জানুয়ারি মাসে কিংস কলেজে যান। উইলকিন্স তাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও ফ্র্যাঙ্কলিন সে প্রস্তাবে রাজি হলেন না। ৬ মার্চ তারিখে ছাত্র গসলিং-এর সাথে প্রকাশ করলেন 'এ'-টাইপ ডি.এন.এ. সংক্রান্ত দুটি গবেষণাপত্র। মজার ব্যাপার হল, ঠিক তার পরের দিনই ওয়াটসন আর ক্রিক তাদের 'বি'-টাইপ ডি.এন.এ.-এর মডেলটি সম্পূর্ণ করেন। পরে ১৭ মার্চ ফ্র্যাঙ্কলিন 'বি'-টাইপ ডি.এন.এ. সংক্রান্ত একটা গবেষণাপত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া যায় তারও বেশ কয়েক বছর বাদে।

এর মধ্যেই ফ্র্যাঙ্কলিন কিংস কলেজ ছেড়ে বারবেক কলেজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ডাক এসেছে বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ জন ডেসমন্ড বার্নালের কাছ থেকে। সেখানে গিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এবং পোলিও ভাইরাস নিয়ে। কিন্তু কিংস কলেজ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে ডি.এন.এ. সংক্রান্ত গবেষণার নথিপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলেন না ফ্র্যাঙ্কলিন। ডিরেক্টর র‍্যান্ডালের নির্দেশমত সমস্ত কাগজপত্র তুলে দিতে হয়েছিল উইলকিন্সের হাতে। আর সবথেকে বিতর্কিত ঘটনাটা ঘটল এর পরেই। উইলকিন্স ফ্র্যাঙ্কলিনের সাথে কোনওরকম আলোচনা না করেই তার 'এ'-টাইপ ডি.এন.এ. সংক্রান্ত ছবি এবং কাগজপত্র তুলে দিলেন ক্রিক আর ওয়াটসনের হাতে। ক্রিক আর ওয়াটসনের বুঝতে দেরি হল না ডি.এন.এ.-র মডেল হিসেবে তারা যে ছবিটা ভাবতে চাইছিলেন, সেটা একেবারে সঠিক। ফ্র্যাঙ্কলিনের গবেষণাই তার অকাট্য প্রমাণ। সেবছরের ২৫ এপ্রিল নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাদের মডেল ''মালকিউলার স্ট্র্যাকচার অফ নিউক্লিক অ্যাসিডস : আ স্ট্রাকচার ফর ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড''। শুধুমাত্র ফুটনোটে একবার উল্লেখ করা হল ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা। বলা হল ফ্র্যাঙ্কলিনের অপ্রকাশিত গবেষণা থেকে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ব্যাস, আর কিছু নয়। ওয়াটসনের ভাষায় যা 'জীবনের গোপনতম রহস্য' সেই ডি.এন.এ.-র মডেল উদ্ভাবনের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬২ সালে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল ওয়াটসন ও ক্রিককে, সঙ্গে উইলকিন্সকেও। কিন্তু আলোকবৃত্তের একেবারে বাইরে থেকে গেলেন ফ্র্যাঙ্কলিন। কারণ তখন তিনি কবরে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন। চার বছর আগেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওয়াটসন, ক্রিক বা উইলকিন্স—তিনজনের কেউই কোনওদিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিলেন না। বরং ১৯৬৮

সালে নিজের লেখা ‘দি ডাব্‌ল হেলিক্স’ বইতে ফ্র্যাঙ্কলিনকে নারীবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্রী সমালোচনা করলেন ওয়াটসন। কিন্তু দুনিয়া তাকে ভোলে নি। মৃত্যুর পর নানান দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মান জানিয়েছে বিভিন্নভাবে। কেউ হয়তো তাদের বিভিন্ন প্রাঙ্গনের নাম রেখেছেন ফ্র্যাঙ্কলিনের নামে। কোথাও চালু হয়েছে ফ্র্যাঙ্কলিন নামাঙ্কিত সাম্মানিক পুরস্কার, কোথাও তার নামে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ বৃত্তি। ১৯৯৭ সালে আবিষ্কৃত গ্রহাণুর নাম রাখা হয়েছে তার নামে, ‘৯২৪১ রোজফ্র্যাঙ্কলিন’। ২০০৩ সাল থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রয়্যাল সোসাইটি চালু করেছে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন সম্মাননা। প্রাপককে ত্রিশ হাজার পাউন্ডের আর্থিক অনুদানের সাথে একটি রূপোর পদকও দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে ‘হিস্টরিক ইংল্যান্ড’ সংস্থা তার সমাধিক্ষেত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে। সেখানে হিব্রু ভাষায় লেখা আছে—‘যার স্মৃতিতে এই ফলক তার আত্মা আজও সহস্র জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ’। সত্যিই এভাবেই বোধহয় বেঁচে থাকবেন সকলের প্রিয় রোজ, রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন।

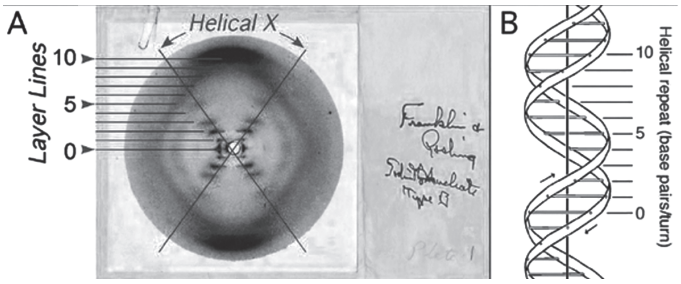

M : 9432220412, e-mail : anindya05@gmail.com

সংবাদ

পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন : ১৩ জন শহিদ

তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন-এ বেদান্তর স্টারলাইট কপার ইউনিট বন্ধের দাবির আন্দোলনের ফলে পুলিশের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে ১২ জন মারা যায় এবং বহু মানুষ জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়।

পরিবেশ আন্দোলনকারী নিত্যানন্দ জয় রামন জানান ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে এক রিপোর্ট জমা পড়ে। রিপোর্টে জানা যায় গোটা এলাকায় জল, মাটি ও বায়ু দূষণের ফলে হাঁপানি সাইনাস, ক্যানসার, শাসকষ্ট সহ নানা রোগ বেড়েছে। মেডিক্যাল কলেজের গবেষকরা জানিয়েছেন ৫ কি.মি. পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দূষণের মাত্রা ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণভাবে নানা রোগের সংক্রমণের পরিমাণ বেড়েছে।

অবশেষে ২৭ মে পরিবেশ কর্মীদের আন্দোলনের ফলে স্টার লাইটের তামার কারখানা পুরোপুরি তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। তামিলনাড়ু সরকারের নির্দেশে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৬ সালে উৎপাদনের শুরু থেকেই এই কারখানা দূষণ ছড়াচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দারা দূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন।

পরিবেশ দূষণ (জল, মাটি ও বায়ু) সমস্যাটি সারাদেশেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ কর্মী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের বক্তব্যকে সরকারের উচিৎ গুরুত্ব দেওয়া।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শপথ

১৯৭২ সালের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পৃথিবীর জল, মাটি ও বায়ুকে দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য শপথ। ২০১৮ বিশ্বপরিবেশ দিবসে ভারত এবার আয়োজক দেশ ছিল। অথচ ভারতেই সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বিপর্যয়। পরিবেশ বিপর্যয়-এর বিরুদ্ধে পরিবেশ কর্মীদের লড়াই চলছে। বিজ্ঞান দরবার, পরিবেশ ভাবনা মঞ্চ, বীজপুর বি. আর. আম্বেদকর গ্রিন পিস অরগানাইজেশন, পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, সবুজমঞ্চ, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব সহ বহু সংস্থাই বিশ্বপরিবেশ দিবসে গাছ লাগানো, গাছ বিতরণ, প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অভিযান, আলোচনা সভা ও পদযাত্রার আয়োজন করে।

র ত ন দে ব না থ

মিশন ‘ডন’ এবং সিরিজ

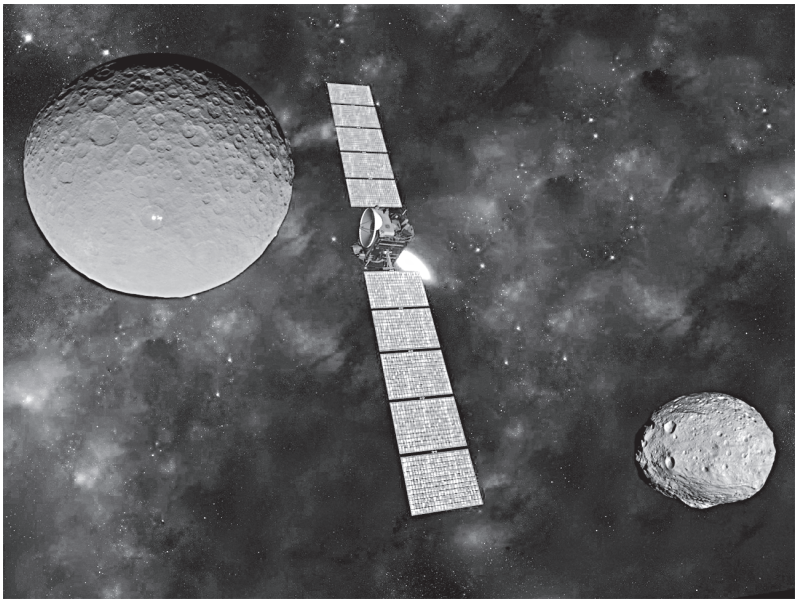

২০০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেভেরাল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হল মহাকাশযান ‘ডন’। উদ্দেশ্য ভেস্তা এবং সিরিজ গ্রহাণু দুটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। ১৮০১ সাল থেকে শুরু করে প্রায় দুশ বছর ধরে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী এলাকায় দূরবীণের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয় অনেক ছোট ছোট বস্তুপিন্ড। একক ভাবে যারা পরিচিত গ্রহাণু হিসাবে। সমবেত ভাবে গ্রহাণুপুঞ্জ। গ্রহগুলোর মতই গ্রহাণুরা পরিক্রমা করে সূর্যকে ঘিরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে গ্রহাণুগুলো হয়তো এক প্রমাণ মাপের গ্রহ তৈরি করে রেখেছিল কোন সময়ে। হয়তো বা মহাজাগতিক কোনো দুর্ঘটনায় তা ভেঙে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে তৈরি হয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ। অথবা এমনও হতে পারে যে কোন একটি গ্রহ তৈরি হতে গিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারেনি। টুকরো টুকরো অবস্থায় পড়ে রয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ হিসাবে।

১৬ জুলাই ডন পৌঁছায় গ্রহাণু ভেস্তার কাছাকাছি। প্রায় বছর খানেক ভেস্তাকে পর্যবেক্ষণ করে রওনা দেয় সিরিজের উদ্দেশ্যে ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে। প্রায় তিন বছর সময় কাল মহাকাশে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে ২০১৫ সালের ৬ই মার্চ ডন পৌঁছায় সিরিজের চারপাশের কক্ষপথে। পৃথিবী থেকে প্রায় ২.৮ বিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ডন পৌঁছায় ভেস্তার পাশে, সেখান থেকে আরও ৪.৯ বিলিয়ন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছয় সিরিজের কাছাকাছি। ভেস্তা এবং সিরিজ পর্যবেক্ষণ করে সৌরজগতের ঊষালগ্নের হদিশ পাওয়া ডন মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। আর সেই জন্যই মহাকাশযানটির নাম ‘ডন’ বা ঊষা।

ডন তার প্রতিটি গন্তব্যে চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণ। যেমন, গ্রহাণু দুটোর ছবি নেওয়া তাদের পৃষ্ঠদেশের প্রকৃতি নির্ধারণ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমান নিরূপণ, তাদের কোন উপগ্রহ আছে কিনা তা দেখা, খনিজ পদার্থের খোঁজ করা ইত্যাদি।

জোহান এলার্ট বোডে ১৭৭২ সালে প্রথম মন্তব্য করেছিলেন যে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে থাকতে পারে আরও কোন গ্রহ। এরও আগে জোহান কেপলার বুঝতে পেরেছিলেন মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে এক শূন্যতার। ১৮০০ সালে জনা চব্বিশ জ্যোতির্বিদের কাঁধে দায়িত্ব পড়ল অনাবিষ্কৃত গ্রহ আবিষ্কারের। যদিও তাঁরা সে সময় সিরিজ করেননি তবুও সফল হয়েছিলেন অনেক গ্রহাণুর সন্ধান দিতে। জিউসেপ্পে পেঁয়াজি ছিলেন ওই দলেরই একজন জ্যোতির্বিদ। সিসিলির আকাদেমী অফ প্যালারমো-র এক ক্যাথলিক যাজক ছিলেন পেঁয়াজি। পিয়াজি ওই দলে যোগ দেওয়ার আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন সিরিজ গ্রহাণুটি। সেটা ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারি।

ডন মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দেখা গেছে সিরিজের ভূমিরূপ খানাখন্দে ভরা। এগুলের কোনটির কেন্দ্রে রয়েছে গর্ত, আবার কোনটির কেন্দ্রে রয়েছে ঢিবির মতো উঁচু জায়গা। যেন পাহাড়। এরকম একটি উঁচু ঢিবির নাম ‘আহুনা মন্স’। বিজ্ঞানীদের অনুমানে শীতল লাভা অর্থাৎ বরফ উদগীরনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এসব উঁচু স্থান। সিরিজের পৃষ্ঠতলে রয়েছে এমন কিছু জায়গা যা দেখতে বেশ উজ্জ্বল। এখান থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় অনেক বেশ পরিমানে তাই এত উজ্জ্বল। এরকম একটি জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ওকেটর’।

ডন মহাকাশযানের শক্তির উৎস দু’রকমের—আয়ন ইঞ্জিন এবং হাইড্রাজিন প্রপেল্যান্ট। আয়ন ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রন করে যানটির বেগ এবং হাইড্রাজিন এটির দিক নিয়ন্ত্রন করে। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে মহাকাশযানটির হাইড্রাজিন প্রপেল্যান্ট শেষ হয়ে যাবে। ফলে হারিয়ে যাবে দিক নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা। যানস্থিত সৌর প্যানেলগুলো বঞ্চিত হবে সূর্যের আলো থেকে, সেন্সর গুলো হয়ে পড়বে অকেজো। এন্টেনা গুলোও থাকবে না পৃথিবীর দিকে মুখ করে। মহাকাশযানটি হয়ে পড়বে অকেজো।

M : 9477934928, e-mail : rdebnath1961@gmail.com

বি জ য় স র কা র

জানো কি?

ঘরের ভেন্টিলেটর ওপরে কেন?

সমস্ত ঘরেই ভেন্টিলেটর বা ঘুলঘুলি থাকে ছাদের কাছাকাছি। তা ঘরের নীচের দিকে থাকলে অসুবিধে কী? ঘরে লোকজনের উপস্থিতিতে মেঝের কাছাকাছি বাতাস গরম আর দূষিত হয়। গরম বাতাস তুলনায় হালকা। প্রকৃতির ধর্ম এই যে গরম বাতাস ওপরে উঠে যাবে আর ভেন্টিলেটর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। ভেন্টিলেটর যদি ওপরে না থাকত তাহলে গরম বাতাস সহজে বেরোনোর পথ পেত না।

আকাশে উড়ে যাওয়া বিমানের উপর বজ্রপাত হয় না কেন?

মেঘ তৈরি হয় বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প দিয়ে। মেঘের দল যখন বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তাদের মধ্যে ঘর্ষণ জলকণাগুলিতে তড়িৎ আধান সৃষ্টি করে। মেঘের এক অংশে ধনাত্মক আধান এবং অপর অংশে ঋনাত্মক আধান তৈরি হয়। এই দুই বিপরীত আধানযুক্ত মেঘের মধ্যে স্পার্কিং যে বিপুল তড়িৎ আধান সৃষ্টি করে তা দ্রুত ধেয়ে যায় ভূপৃষ্ঠের দিকে নিজেকে প্রশমিত করতে। বজ্রপাতের এই পথে ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাছপালা, বাড়িঘর যা কিছু পড়ে তার উপর অংশে বিপুল তড়িৎ বিভবের সৃষ্টি হয়। গাছ বা বাড়ির নীচের অংশে তখন শূন্য বিভব। দুই বিভবের এই বিরাট পার্থক্যের ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আকাশ পথের বিমানের সঙ্গে ভূমির কোনো সংযোগ (earthing) থাকে না, অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের জন্য যে বিভব-প্রভেদ দরকার হয় তা ঘটে না। ফলে বিমানের উপর বজ্রপাত হলেও তড়িৎ সংযোগের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বিমানের যাত্রীরা নিরাপদেই থাকেন।

M : 9432335882 e-mail : bijoysarkar4786@gmail.com

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

আপেক্ষিকতা

একই গতি দুইটি ট্রেন চলেছে পাশাপাশি
এই জানালা বলছে কথা ওই জানালা হাসি
চোখ ফেরেনা দেখছে দুজন
নেই যে কোনো কথোপকথন
যেন হঠাৎ থমকে সময় বাজলো যখন বাঁশি।

বিড়াল

একটি বিড়াল বেঁচে আছে একটি বিড়াল মৃত
একটি দুই বিড়ালে রয়েছে আবৃত

একটি বাক্স নক্সা আঁকা একটি দরজা তার
আসছে যাচ্ছে একটি বিড়াল করছে পারাপার—

নেই যেখানে সেখানটাতে আছে এবং থাকা
আছে-বিড়াল নেই-বিড়ালের চিরকালের সখা

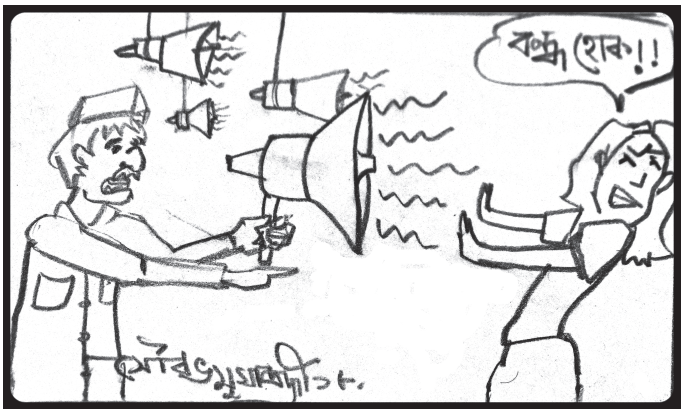

Mob. 8961401423

প্রিয় পাঠক

- পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান। লেখা হবে ৬০০ অথবা ১১০০ শব্দের মধ্যে।
- পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।
- পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।

পত্রিকা যোগাযোগ

● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● শিয়ালদহ স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ● স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak